উনিশ–বিশ শতকের পত্রপত্রিকায় হিন্দু বাঙালি মেয়েদের কলমে প্রতিফলিত গার্হস্থ্য, সন্তানপালন, পরিবারের স্বাস্থ্যবিষয়ক ভাবনা

সুতপা মুখোপাধ্যায়

Abstract

Domesticity, Childcare, family health and Writings of Women in Magazines : Some decades of 19th and 20th century

Bengali Society was led by a new fervour of domesticity in the 19th century. The concept of ideal home influenced the Bengali literati and women too. Health of the members of a family became an important issue with which the role of women as caregiver got attached. Since the later half of the 19th century the Bengali literati took advantage of print technology to express their opinion through writings regarding home, family, childcare, general health etc. Women also came forward and expressed their opinion on those issues. They showed their concerns for the health of the family members and gradually of their own. Women wrote in several magazines about maternity and childcare. They pointed out the bad effect of child marriage on the health of women. They discussed about the domestic duty of women. At the same time they became critical of certain issues. Sometimes women writers followed the footsteps of the male writers and criticised their own folk with the same tone. In the 20th century, political changes took place in Bengal. Cultural changes also happened during this time. Women became more conscious of their health issues. They wanted to see the world outside the boundary of their kitchens. They wrote that to maintain the health of the family women should gather knowledge about health. Women felt that health was priceless. Some of them had the opinion that their home was like a state. Indigenous male society and the colonial rulers both perceived women's health as reproductive health. Women also put stress on motherhood and used it as a tool to establish their rights in society. Women talked of the bad condition of labour room, problem of motherhood, birth control etc. There is no doubt that they created a narrative for themselves.

Keywords: *Nineteenth century, women's writings, child care, hygiene, public space.*

হিন্দু বাঙালি সমাজে উনিশ শতকে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তা প্রধানত কেন্দ্রীভূত থেকেছিল সুগৃহিণী ও সুমাতার ধারণায়। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তা গার্হস্থ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে এমন ধারণা বাঙালি শিক্ষিত সমাজে প্রাধান্য

পেয়েছিল। উনিশ শতকের বাঙালির মননে পাশ্চাত্যের গার্হস্থ্যের ধারণার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বাঙালি ভদ্রলোকের চেতনায় গৃহ ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন এক নবতর বিন্যাস নিয়ে উঠে এসেছিল। গার্হস্থ্যের ধারণার মধ্যে এসে পড়েছিল পরিবারের স্বাস্থ্যের বিষয়টি। সেখানেও বাঙালি ভদ্র সমাজ পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষায় মেয়েদের ভূমিকা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিল। মেয়েদের লেখাপড়াকে গার্হস্থ্যের পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াসের মধ্যেই উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে মেয়েরা কালি ও কলমকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল জনপরিসরে। সেখানে স্ত্রীশিক্ষার পাশাপাশি উঠে এসেছিল মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি মহিলাদের অবহেলিত স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ। গৃহ এবং তার আদর্শ নিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ উনিশ শতকের নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আদর্শ গৃহের ভাবনা প্রভাবিত করেছিল শিক্ষিত মহিলাদেরও। পরিবারের সুস্বাস্থ্যের প্রশ্নেই গৃহিণীদের প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও এই সময় থেকেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

উনিশ শতক থেকেই গৃহ, পরিবার, সন্তানপালন, স্বাস্থ্যরক্ষার মত বিষয়গুলি বাঙালির কলমে উঠে আসতে থাকে। এই শতকে মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হওয়া পত্রিকার লেখক এবং পাঠকগোষ্ঠীও তৈরি হয়েছিল, যার লেখিকারা বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার থেকে এসেছিলেন। সাতের দশক থেকে মহিলাদের জন্য প্রকাশিত জনপ্রিয় পত্রিকা *বামাবোধিনী*–তে গার্হস্থ্য, মাতৃত্ব, সন্তানপালন নিয়ে মেয়েদের অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮১ সালে পার্ব্বতী বসু লেখেন প্রকৃত গৃহিণী তিনি, যিনি পরিবারের সকলের অভাব, সুস্থতা, অসুস্থতা, শান্তি, অশান্তি বিষয়ে অবগত।[১] গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন:

> সামান্য সামান্য চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের কথঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বকালের গৃহিণীদের এ বিষয়ে বিশেষ বহুদর্শিতা ছিল, এখনকার গৃহিণীদের এই বিষয়ে অত্যন্ত শৈথিল্য ভাব দৃষ্ট হয়। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাঁহারা সন্তানদিগের অল্প অসুখেই চিকিৎসকের প্রার্থী হন, আর যাহাদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁহারা সেইরূপ অসুখকে উপেক্ষা করেন, এই দুয়ের ফলই মন্দ। এক দিকে অর্থ নষ্ট অপর দিকে রোগ বৃদ্ধি। তাই প্রত্যেক সংসারে চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।[২]

ঔপনিবেশিক শাসনকালে, সংসার চালানোর অভিজ্ঞতায় অর্থনৈতিক ভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের যে অসচ্ছলতা ছিল সে বিষয়ে সেকালের মহিলারা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই সুশৃঙ্খলা ও আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা মেয়েদের লেখায় স্থান করে নিয়েছে বারবার, যার সঙ্গে স্বাস্থ্যহানির প্রসঙ্গটিও যুক্ত ছিল। ১৮৮৩ সালের একজন মহিলা তাঁর প্রবন্ধে গৃহিণীর আলস্য ও তার পরিণতিতে পরিবারে রোগের

উল্লেখ করে লেখেন:

> যে গৃহের গৃহিণীরা বাবুয়ানা করেন, অথবা আলস্য বশতঃ সংসারের কাজে মনোযোগ দেন না সেই গৃহ যে বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ সেই গৃহ রোগ শোকের আলয় হইয়া উঠে...তিনি কোন কাজই মনোযোগের সঙ্গে দেখেন না, কাজেই তাহা দাস দাসীর হস্তে দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এমন কি নিজের সন্তানের লালনপালন পর্য্যন্ত দাস দাসীকে ভার দেন। সুতরাং শিশুদিগকে সদা সর্ব্বদাই অসুখ বিসুখে অস্থির করে।[৩]

বহু লেখাতেই দেখা যেত সন্তানপালনে অজ্ঞতা নিয়ে বাঙালি মেয়েরা সমকালীন শিক্ষিত পুরুষের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন মেয়েরা। ১৯০০ সালে *বামাবোধিনী* পত্রিকা–য় শ্রীবিনোদিনী সেনগুপ্তা লিখছেন:

> পৃথিবীতে সকল গৃহেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু সন্তান জন্মাবার আগেই সবায় সন্তান পালনের উপযোগী শিক্ষা লাভ করেনা। সুসন্তানের জন্য জননীকেও যথোচিত শিক্ষায় নিজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা কাম্য। সন্তানের মধ্যে দিয়েই মা সংসারে মহৎ কাজের বীজবপন করতে পারেন এবং এই কারনেই মাকে দৃঢ়, পবিত্র ও চরিত্রবতী হতে হবে।[৪]

মায়ের ভাবমূর্তি নির্মাণে জোর দেওয়া হয় এই যুগে। মা মানেই পবিত্রতা এবং সততার প্রতিমূর্তি এই ধারণা শিক্ষিত মহিলারাও তাঁদের লেখাতে প্রকাশ করেন। সুসন্তান তৈরি করাই এখানেপ্রধান লক্ষ্য ছিল। আবার নিস্তারিণী দেবীর প্রবন্ধে পাওয়া গিয়েছিল বিনা শ্রমে স্বাস্থ্য হানির কথা। তিনি লিখছেন:

> স্ত্রীকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া কেবল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ ক্ষান্ত থাকা কোন ক্রমে বিধেয় নহে, পুরুষের ভাবের সমভাবী হইয়া যাবতীয় সকার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ পৃথিবীর শান্তি কুশল বিস্তার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য...। অতএব যথাসাধ্য ক্ষুধাতুরকে অন্ন, তৃষ্ণার্তকে জল ও পীড়িতকে ঔষধী প্রদান এবং বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করা উচিত।[৫]

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই সময়ে শিক্ষিত মহিলাদের একটা নিজস্ব কথন তৈরি হয়েছিল এবং তাদের লেখার মধ্যে শুধু পরিবার নয়, সমাজের প্রতিও তাদের দায়িত্ব পালন করার গভীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে পীড়িতের সেবা বা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে মেয়েদের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে মানকুমারী দেবী লেখেন, 'গৃহিণীর লেখা পড়া, আবশ্যক ব্যবহার্য্য সেলাই, ধাত্রী বিদ্যা, শিশু পালন, গৃহচিকিৎসা, আহার্য্য দ্রব্যের গুনাগুণ এবং দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব জানা কর্ত্তব্য।[৬] অপর একটি প্রবন্ধে তিনি বাঙালি মেয়েদের গৃহধর্ম প্রসঙ্গে লেখেন:

> শারীরিক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ মহাপাপে লিপ্ত হই, এবং পীড়াক্রান্ত হইয়া শরীর এরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় যে জীবনকেও দুর্ব্বহ মনে হইতে থাকে অতএব শরীরকে সুস্থ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। স্নান, আহার, পান, নিদ্রা, পরিশ্রম, বিশ্রামপ্রভৃতিপ্রভৃতি দৈনিক কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পাদিত হইলে শারীরিক কর্ত্তব্য পালন করা হয়। এই সকল নিয়মাবলী অনেক সুবিজ্ঞ মহোদয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, 'স্বাস্থ্যরক্ষা', 'শরীর পালন' প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া তন্নিয়মে চলিলেই হইতে পারে ইহা অধিক আয়াস–সাধ্য নহে।[৭]

গৃহধর্মের একটি দিক যে স্বাস্থ্যরক্ষা সে বিষয়ে সচেতন হয়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েরা। অনেক লেখাতেই মহিলারা রোগীর শুশ্রূষার জন্য পথ্য চিকিৎসার উপরে আলোকপাত করেন। কুমুদিনী রায় লিখছেন:

> স্বাস্থ্য যখন সকল ধর্ম্মের সকল কর্ম্মের ও সকল সুখের মূল তখন রোগীর শুশ্রূষা দ্বারা যদি তুমি তাঁহাকে স্বাস্থ্য দিতে না পার তবে রোগীর কোন উপকার করে না। ঔষধাভাবে পথ্য দ্বারা রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পথ্যাভাবে বাঁচিতে পারে না। যা না করে বৈদ্য তা করে পথ্য, এই কথাটি অতি সার। সুতরাং পথ্যাদি দ্বারা রোগীর শুশ্রূষা করাও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অন্তর্গত।[৮]

স্বাস্থ্যরক্ষা থেকেই যে গার্হস্থ্যের সুখশিক্ষিত বাঙালি মেয়েরা তাদের সেই অনুভবকে লেখায় প্রকাশ করেছিল। বিনোদিনী সেনগুপ্তা *বামাবোধিনী পত্রিকা*–য় *রমণীর কার্য্যক্ষেত্র*প্রবন্ধে লেখেন:

> স্ত্রীলোকের পক্ষে গৃহকার্য্য যেমন আবশ্যক অপরাপর কর্ত্তব্যগুলিও তেমনি প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যরক্ষা, মিতব্যয়িতা, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গৃহকার্য্যেপ্রবিষ্ট হইলে সুফলেরপ্রত্যাশা করা যায়। গৃহের যাবতীয় লোকদিগের স্বাস্থ্য গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। তিনি যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী অবগত হন ও তদ্রূপ কার্য্য করেন, তবে সকলেই স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন।[৯]

বিনোদিনী সেন *গার্হস্থ্য* প্রবন্ধে লেখেন:

> পুর্ব্বে এ দেশের লোকেরা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ দেশবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই রোগ ও জরায় আক্রান্ত হইয়া মানব–লীলা সম্বরণ করিতেছেন, কিন্তু ইহা ইচ্ছা করিলেই আমরা দূর করিতে পারি।... স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেই কার্য্যপটুতা লাভ সহজ। আমরা অনেক সময়ে অভ্যাসের দোষে রোগ ভোগ করি ও কষ্ট পাই। আমাদিগের অভ্যাসের পরিবর্তন করিলে, সেগুলি সমূলে বিনষ্ট হয়, অথচ তাহা না করিয়া আমরা কেবল ঔষধ

> প্রয়োগ করি। আবার আমরা অনেক সময় অনাবশ্যক কষ্ট, যাতনা ও পীড়া ভোগ করি, এবং সেই রোগ সন্তানদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যাই।[১০]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার সাহিত্য জগতে উপন্যাস বা নভেল এর জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে মহিলা পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একাংশকে স্বস্তি দেয় নি। অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *Desire and Defiance A Study of Bengali Women in Love*, 1850-1930 গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাঙালি শিক্ষিত সমাজ মেয়েদের নভেল পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। মেয়েদের নভেল পাঠ গার্হস্থ্য জীবনের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেবে এই উদ্বেগ কাজ করেছিল বাঙালি ভদ্রলোকের চেতনায়।[১১] মেয়েদের লেখাতেও গার্হস্থ্য ধর্মপালনে মেয়েদের জন্য উপদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই পুরুষকণ্ঠের অনুরণন। *বামাবোধিনী* পত্রিকা–য় কুমুদিনী রায় লেখেন:

> গৃহিণীর লেখা পড়া শিক্ষা করা আবশ্যক এ কথা আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, অতএব নভেল নাটকের পরিবর্ত্তে শরীর পালন স্বাস্থ্যরক্ষা ধাত্রীশিক্ষা এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকগুলি মনোযোগের সহিত গৃহিণীর পাঠ করিয়া যাহাতে পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ও ধাত্রীশিক্ষা লিখিত ঔষধগুলি আনাইয়া গৃহে রাখিবেন।[১২]

মহিলাদের কী ধরনের গ্রন্থ পাঠ করা উচিত এই সময়ের মেয়েদের লেখায় সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হত। সুশীলা সুন্দরী মিত্র ১৯০৭ সালে লিখছেন:

> সমস্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত গৃহস্থালীর কর্ম্ম ও রন্ধনকর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত। পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। শরীর সুস্থ থাকিলে সমুদায় সকর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে আত্মোন্নতির জন্য পুরাণ, ইতিহাসাদি জ্ঞানমূলক গ্রন্থ পাঠ করা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের একান্ত কর্তব্য।[১৩]

রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ শতকের সূচনায় বাংলার সমাজসংস্কৃতিতেও কিছু পরিবর্তন এসেছিল। রাঁধাবাড়ার বাইরেও মেয়েদের আরও কিছু কাজ থাকতে পারে এই সময়ের মহিলাদের লেখালিখির মধ্যে সেই ভাবনার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। তাঁদের লেখায় স্বাস্থ্যসচেতনতার প্রসঙ্গ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস ১৯০২ সালে লিখলেন:

> পুরমহিলাদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাঁহাদের রন্ধনগৃহে অবস্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে...আমি ইহাই বলিতে চাই যে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা শুধু রন্ধনগৃহে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না। সন্তান পালন, শিশুদের শরীর সুস্থ রাখিবার উপায়, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা রমণীদিগের

একান্তই আবশ্যক।[১৪]

১৯০৯ সালে *মহিলা* পত্রিকায় শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী লেখেন, *স্বাস্থ্য অমূল্য জিনিস। স্বাস্থ্য না থাকিলে মনে শান্তি থাকে না এবং মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।*[১৫] স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে দেশের কাজের ধারণাটি ব্যপ্ত হয় পরিবার গঠনের মধ্যে। গৃহ যে একটা রাষ্ট্র, তারই মধ্যে একইভাবে শৃঙ্খলার প্রয়োজন এই ভাবনার প্রকাশ মেয়েদের লেখাতে দেখা যায়। শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য রক্ষা ও গার্হস্থ্য ধর্মে গুরুত্ব পেতে থাকে এবং মাতৃত্বের ধারনাকে স্বাস্থ্য সচেতনতা কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

দেশীয় পুরুষ সমাজও ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে মেয়েদের স্বাস্থ্য সীমাবদ্ধ ছিল প্রজনন স্বাস্থ্যের ধারণায়। মেয়েরাও তাদের লেখাতে মাতৃত্বের জায়গাটিকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিত। গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে মায়ের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। ১৮৮৯ সালে মানকুমারী বসু *বামাবোধিনী* পত্রিকা–*য়* লিখছেন:

> মাতৃপ্রকৃতি রমণীর অখণ্ডনীয়, ঐশিক নিয়ম। শিশুপালন মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য। সন্তানের দৈহিক বিকাশ মাতার হস্তে, সেইরূপ তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রথম গঠনের ভারও মাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। মাতার অনভিজ্ঞতায় অনেক সন্তান রোগগ্রস্ত, নির্ব্বোধ ও হীন চরিত্র হইয়া থাকে ইহা কে অস্বীকার করিবেন? অতএব রমণী শিশু–পালন ভারগ্রহণ করিয়া শিশুর ত্রিবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইবেন...বলা বাহুল্য শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মাতাকে বিশেষ অভিজ্ঞা হইতে হইবে। যে মাতা সু–পালনের দ্বারা সন্তানকেপ্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারেন, তিনি যে কেবল গৃহ ধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন করিলেন এমত নহে, তাঁহা কর্তৃক জগতের এক মহৎ কার্য্যসম্পন্ন হইল বলিতে হইবে।[১৬]

সন্তানপালনের পাশাপাশি সন্তান প্রসবের বিষয়েও এই সময়ের মেয়েরা সচেতন হয়ে উঠেছিল। সূতিকাগার এবং প্রশিক্ষিত দাই নিয়োগের বিষয়েও তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। হেমন্তকুমারী চৌধুরী ১৯০৩ সালের *অন্তঃপুর* পত্রিকা–য় লিখছেন সূতিকা–গৃহ নামকপ্রবন্ধ। তিনি লিখছেন:

> এদেশে সর্ব্বত্রই আঁতুড় ঘরের অবস্থা অতীব শোচনীয়। গৃহাভ্যন্তরে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ও স্যাঁতস্যাঁতে সেইখানেই সাধারণতঃ আঁতুড়ঘর নির্মিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে গৃহপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে সূতিকা গৃহরূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ক্ষুদ্র ঘর নির্মিত হয়। প্রসবের পরে মাতা ও শিশু একমাত্র বা ততোধিক কাল সেই গৃহে বাস করে ... সূতিকা–গৃহে বাসকালে শয্যার নিমিত্ত খাট, চৌকি, তোষক বা অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। কী শীতে, কি বর্ষা,

> সকল ঋতুতেই এরূপভাবে সুতিকা–গৃহ নির্মিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্কগোময় বা কাষ্ঠের ধোঁয়াতে অহর্নিশি বাস করিয়া মাতা ও শিশুকে কত ক্লেশই না সহ্য করিতে হয়, কেবলমাত্র সন্তানের মুখ দেখিয়াই যে মাতা সমূদয় কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই।[১৭]

হেমন্তকুমারী চৌধুরী ১৯০৩ এর *অন্তঃপুর* পত্রিকা–য় লেখেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নবজাতকের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন যার কারণ হিসেবে তিনি খাঁটি দুধ,স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও উপযুক্তভাবে প্রতিপালনের উপকরণের অভাবের মত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ধাত্রীদের অজ্ঞতা। প্রসবের পর মায়ের সূতিকা জ্বর ও জরায়ুর পীড়া বিষয়ে সচেতনতার অভাব প্রসূতির জীবন বিপন্ন করত ইংরেজ রাজত্বে জন্মদান ব্যবস্থায় যে সচেতনতা দেখা গিয়েছিল সে বিষয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[১৮] স্বাস্থ্যরক্ষা যে মেয়েদের শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য সে কথা মেয়েদের উচ্চারণেপ্রকাশ পেয়েছে বারবার। ১৯০০ সালের *অন্তঃপুর* পত্রিকায় হেমাঙ্গিনী চৌধুরী লিখছেন, যে দেশের স্ত্রীলোক যত বিদ্যাবতী সেই দেশ অপেক্ষাকৃত তত উন্নত, একথা স্বীকৃত লোকমাত্রেই স্বীকার করিবেন... কিপ্রকারে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয় এবং শৈশবে কিপ্রকারে শিক্ষা দিলে শিশু পরে সত্যপ্রিয় বা সুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হবে, এই সব উত্তমরূপে শিখিতে ও বুঝিতে হলে লেখাপড়া শিখার নিতান্ত দরকার।[১৯] এই সময়ে মহিলারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যশিক্ষার জ্ঞানের উপরে যে গুরুত্ব দিয়েছে তাতে স্বাস্থ্যসচেতনতাই প্রকাশ পেত। তিনি লেখেন:

> দ্রব্যগুণ অর্থাৎ কোন জিনিষ স্বাস্থ্যপ্রদ ও কোন জিনিষ অপকারী, কোন দ্রব্য কীভাবে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে, এইসব জ্ঞান থাকিলে স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। পল্লীগ্রামে সবসময় ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায়না, স্ত্রীলোক সামান্য সামান্য পীড়ার লক্ষণ, ঔষধাদি ও সাধারণ নিয়মাবলী শিক্ষা করিলে অনেক সময় অনেক রোগের হাত এবং উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।[২০]

সুখদা গুপ্ত তাঁর *হিন্দু সমাজে বঙ্গনারী* প্রবন্ধে পরিণয় ও সংসার যাত্রার মধ্যেই মেয়েদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশের আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নিয়ে আক্ষেপ করে লেখেন:

> শিক্ষার যত কেন সুবিধা থাকুক না, বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েদের এ শিক্ষারপ্রকৃত সুফল লাভ হইতেছে না। ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ সামাজিক নানা কুরীতি কুশাসন ইহার বশবর্ত্তীতাই যে বঙ্গমহিলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান অন্তরায় ইহা ভয় বিহ্বল চিত্তে হইলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে...আজকালপ্রায় সকল হিন্দু ভদ্রলোকের ঘরেই

> একটু একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা হইতেছে, যদি এই চর্চা যথোচিতভাবে পরিচালিত হইত, তবে এই যৎসামান্য লেখাপড়াতেও যে অনেক সুফল ফলিত তাহার সন্দেহ নাই...বাস্তবিক যদি মেয়েদের প্রত্যেকের জীবনে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া আত্মচিন্তা ও আত্মগৌরব রক্ষা করিবার একটু ক্ষমতা ও স্পৃহা থাকিত, তবে যাবতীয় প্রতিকূল ঘটনা উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় সহজসাধ্য হইত, কিন্তু সে শক্তি কই? বাঙালি মেয়েদের অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ।[২১]

১৯০১ সালের *অন্তঃপুর* পত্রিকা–র সম্পাদকের লেখায় হেমন্তকুমারী চৌধুরী ভারত *মহিলার স্বাস্থ্য* প্রবন্ধে এ দেশের মেয়েরা কীভাবে নীরবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করে মারা যায় সেই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন:

> যে দেশে সুকুমারী বালিকার মুখে যৌবনের মধুময় লাবণ্য বিকশিত হইতে না হইতে প্রবীণা হইয়া পড়িতেছে, অথবা শৈশবেই নিরাশার অন্ধকারে যাহার বদন ম্লান হইয়া যাইতেছে, সেই দেশীয়া স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্য বিষয়ে এর কি আলোচনা করিব অথবা বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনের কিই বা চিত্র অঙ্কিত করিব?[২২]

মেয়েদের অমূল্য স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ যে প্রায় অধরাই থেকে যায় সে বিষয়ে পাঠককে তিনি সচেতন করে জানান যে মহিলাদের স্বাস্থ্যহানির প্রভাব পড়ে সন্তানদের উপরে, এর ফলে সংসারে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার ফল পরিবারের সকলকেই ভোগ করতে হয়। এই সময়ে অন্তঃপুরের স্বাস্থ্য বিষয়ে মেয়েরা সচেতন হচ্ছিল, অন্যদিকে বাল্যবিবাহ নিয়েও সচেতনতার পরিসর তৈরি হচ্ছিল মেয়েদের মধ্যে। মেয়েদের লেখাতেই উঠে এসেছিল মেয়েদের বিবাহের বয়স প্রসঙ্গটি। *অন্তঃপুর* পত্রিকা–য় জনৈক হিন্দু মহিলা প্রবন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই বলে যে:

> আমাদের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ বহুদিন হইতেপ্রচলিত কিন্তু সেকালে পরিবারে যেরূপ রীতিনীতি ছিল, তাহাতে তখনকার লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পারিবারিক যেরূপ বিশৃঙ্খলা হইতেছে, তাহাতে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করা একান্ত কর্তব্য। তখন মেয়েদের যে বয়সে বিবাহ হইত, তাহার পর এক বৎসর শ্বশুরালয়ে যাওয়া বা দ্বিরাগমনের ব্যবস্থা ছিল না। এক বৎসর কেহবা দুই তিন বৎসর কন্যাকে নিজগৃহে রাখিয়া দিতেন। এক্ষনে অনেকেই সেই সামাজিক রীতিনীতি বা সেকালের প্রথার গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া কন্যাকে বিবাহের পরই পতিগৃহে প্রেরণ করেন। ইহার যে কি বিষময় ফল তাহা বোধহয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।[২৩]

এই সময়ের সমাজব্যবস্থাকে প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েই একাধিক মহিলা লেখকের লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছিল প্রতিবাদ। সামাজিক রীতিনীতির তুল্যমূল্য বিচার যে

মেয়েদেরই করা জরুরি তাও মেয়েদের লেখাতে প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ পিতৃতন্ত্রের নানারকম নিয়ন্ত্রণের ভার বইতে হত মেয়েদেরই। তবুও মেয়েদের লেখাতে বহুক্ষেত্রে পুরুষকণ্ঠের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। মনে হতে পারে, নতুন আর পুরনোর দ্বন্দ্বে মেয়েদের নিজেদের অবস্থানকে বোঝার ক্ষেত্রে কোথাও একটা অনিশ্চয়তা কাজ করেছিল। তাই মেয়েদের লেখাতে উঠে এসেছিল মেয়েদের সমালোচনা, যে সমালোচনা পিতৃতন্ত্র বারংবার করেছে মেয়েদের একটি গণ্ডিতে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে। এই সময়ের মেয়েরাও অনেক সময় হয়ে উঠছে পিতৃতন্ত্রের কণ্ঠস্বর। উক্ত প্রবন্ধেই একাধারে যেমন বাল্যবিবাহকে মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য দোষাবহ মনে করা হয়েছিল এবং প্রসব বিষয়ে বাড়ির লোকেদের উদাসীনতাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, একই সঙ্গে মেয়েদের আলস্যকে দায়ী করা হয়েছিল তাদের স্বাস্থ্যহীনতার জন্যে। এই প্রবন্ধে তাঁদের তুলনা করা হয়েছিল সেইসব পূর্ববর্তিনীদের সঙ্গে যাঁরা অতি ভোরে উঠে সংসারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতেন।[২৪] তবে একথা অনস্বীকার্য যে একটা ব্যবস্থাকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধে, যে ব্যবস্থাকে মূলত মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহের জন্য কি কুফল ঘটতে হতে পারে তার কঠোর সমালোচনা এই লেখায় স্থান পেয়েছে। একজন মহিলার কলমেই বেরিয়ে এসেছে এই কথা :

> শতকরা ৯০ জন লোক মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ ব্যক্তি। অল্প বয়সে প্রসবের পর অর্থাভাবে অনেকের গৃহে, তেমন নীতিমত পুষ্টিকর খাদ্যই প্রসূতি পায় না, উপযুক্তরূপে সেবা শুশ্রূষা হয় না। একে বালিকা বয়সে প্রসব, তাহার উপর সেবা শুশ্রূষা ও পুষ্টিকর আহারের অভাব। এই সব কারণে দিন দিন বালিকার দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় সাধারনতঃ বাড়ির লোকে প্রসব বিষয় বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। পুত্রবধূ পুত্র প্রসব করিল কিনা ইহাই লোকে বেশিরভাগ দেখিয়া থাকে, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৃষ্টিপাত করিবার ততোধিক আবশ্যকতা কেহই দেখেন না। অনেকস্থানে প্রসবক্ষেত্রেই প্রসূতি প্রসূত সন্তান ভবলীলা সাঙ্গ করে। তাহার পর যাহারা বাঁচিয়া থাকে বৎসরে একবার প্রসব করিলে কয়দিন তাহার শরীর ভাল থাকিবে?[২৫]

পুরুষ যা বলবে শুধু তাই নয়, নিজেদের ভাবনা নিজেদের মত করে কিছুটা হলেও ভাবতে পেরেছিল নতুন যুগের ভদ্রমহিলারা। নিজেদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন এই সত্যটি বুঝতে শুরু করেছিল মেয়েরা। ১৯০০ সালে *অন্তঃপুর* পত্রিকা–য় শ্রীহেমন্তকুমারী চৌধুরী লেখেন:

> সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কত চেষ্টা, কত আয়োজন, আর আমরা রোগের যন্ত্রণা চিরজীবন সহ্য করিতেছি। দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া নারী জীবনের কর্ত্তব্য

> পালনে অসমর্থ হইতেছি। সুস্থ শরীরে যখন থাকি তখন সুখলাভের কত আয়োজন সংগ্রহ করিতে পারি কিন্তু রোগশয্যায় শায়িত হইলে কত অসুবিধা ভোগ করি।[২৬]

তিনি মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে মহিলা শুশ্রূষাকারিণী তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন এবং সেই কাজে মেয়েদের আহ্বানও জানিয়েছিলেন। নিজের লেখনীর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবর্ষের বহু নারীকে তাঁদের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন:

> পাঠিকা ভগিনী। সন্তানের জননী, স্নেহময়ী প্রতিবেশীগণ, আজ কি ক্ষুধার্তের ক্রন্দন শুনিতেছেন না? শিক্ষিতা ভগিনীগণ, আপনাদের শিক্ষা কি কেবল পুস্তকের পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ থাকিবে? তাহা কি জনসেবায় লাগিবে না? ধনীর গৃহিণীদের আপনাদের ধন কি কেবল গৃহে লৌহ সিন্দুকেই সঞ্চিত থাকিবে? ...নারী জাতির দুঃখ যদি নারীগণ না বুঝিবেন তবে আর কে বুঝিবে... ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, পিপাসায় কাতর কণ্ঠে জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, রোগীকে ঔষধ পথ্য দান করার যায় পুণ্য আর নাই।[২৭]

স্বাস্থ্যভাবনার মধ্যে দিয়ে বৃহৎএর সঙ্গে মেয়েদের কর্মের যোগের একান্ত অভিলাষ প্রকাশ পেয়েছিল মেয়েদের লেখায়। স্বাস্থ্যকে মেয়েরা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরের গণ্ডি থেকে বার করে আনার প্রয়াস যে নিয়েছিল সেকথা অনস্বীকার্য। গার্হস্থ্য, সন্তানপালন, স্বাস্থ্যরক্ষাকে কেন্দ্র করে এসেছিল অন্তঃপুরের বাইরে মেয়েদের বৃহত্তর পরিসর ও অধিকারের দাবি।

গার্হস্থ্যক্ষেত্রে রন্ধন বা সন্তানপালন যেগুলি ছিল খুব হেলাফেলার বিষয়, যুগপরিবর্তনের ফলে মেয়েদের লেখায় সেগুলোই হয়ে উঠলো তাদের বিশেষ বিদ্যা যে বিদ্যা পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষা বা জাতীয় শক্তিগঠনের কাজে লাগবে বলে মনে করা হত। মেয়েদের লেখায় মেয়েদের অধিকারের একটি ধারণা এবং তার কর্মের গুরুত্ব গড়ে উঠতে লাগল। মেয়েদের কলমেই বেরিয়ে এল এমন কথা:

> গৃহকর্ম্ম পটুত্বের সহিত নারীত্বের কোন যোগ নাই। ইহাতে নৈপুণ্য, সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি সকলেরই থাকা সম্ভব নয়। ...সন্তান পালন ত সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির স্বতন্ত্র কাজ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার গুরুত্ব এত বেশী হইলেও গৃহকর্ম্মকেই (বিশেষতঃ আমাদের দেশে) সর্ব্বত্র যেন অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়।[২৮]

১৯২৩ সালে *প্রবাসী* পত্রিকায় শান্তা দেবী লেখেন:

> উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, স্বাধীনতা যে সকল মানবের অর্থাৎ নারীরও জন্মলব্ধ সম্পত্তি, এবং বাল্যবিবাহের, বিশেষতঃ বাল্যমাতৃত্বের ফলে যে নারীর দেহ

> মন ও ভবিষ্যৎ বংশের বহু ক্ষতি হয়, এসকল কথা এদেশেও আর নূতন নয়... বহু অর্দ্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত নর–নারী দেশের কি ক্ষতি করিতেছেন তাহা না বুঝিয়া, নিজেদের অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া কাগজেকলমে যুক্তিহীন আবল–তাবল লিখিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে নব নব বাধা সৃষ্টি করিয়া নারীসমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের লেখনী প্রসূত এইসব অপুর্ব্ব সন্দর্ভে দূরদৃষ্টি কোথাও নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চিহ্নও দেখা যায় না...।[২৯]

সমাজে হিন্দুনারীর যে রূপকল্প নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল যেখানে বহু ঝঞ্ঝাঝড়েও তাঁরা প্রাতে অঙ্গনে গোবর ছড়া দিতে বিরত হন না, পুরুষকে আঁচল চাপা না দিয়ে জাগিয়ে চেতন করে দেন, অবরোধপ্রথা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বাজে চিন্তায় মন দেন না সেই রূপকল্পকে তীব্র বিদ্রূপ করেন লেখিকা। তিনি লেখেন যে এই সব মেয়েরাই প্রতি বছর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশ, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতিতে স্বামীপুত্রকে হারাচ্ছেন।[৩০] অবরোধপ্রথা হিন্দুদের মধ্যে নেই, এই মতের বিরোধিতা করে লেখিকা যুক্তি দেখান:

> পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার ভয়ে বা লেডি ডাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, সূতিকা ও নানা স্ত্রীরোগে ভুগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া পরলোকযাত্রা করে কাহারা? বাহিরে আসিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিবার লজ্জায় সন্তানসহ আত্মহত্যা করিয়াছিল কোন দেশের মেয়ে? উচ্চপ্রাচীর ও বন্ধ জানালার ডৎপাতে বিধাতার বায়ু বিষ হইয়া প্রাণবধ করে কোন দেশের মেয়েদের? গাড়ীর অভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাধা পাইতেছে কোন দেশে?[৩১]

এই সময়ের মেয়েদের ভাবনায় শুধু অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ না করাই নয়, পরিবার ছোট রাখার পরিকল্পনাও গুরুত্ব পেয়েছিল। উক্তপ্রবন্ধে বলা হয়েছে:

> সন্তানকে নীরোগ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে শুধু মায়ের নিজের ঘরটি সুন্দর হইলেই হয় না সহর, প্রতিবাসী, রাস্তাঘাট, দোকানবাজার, সবেরই উন্নতি দরকার। ধনীর ও শিক্ষিতের ঘরের সন্তানকেও যে প্লেগে কলেরায় মরিতে দেখা যায়, বাহির হইতে রোগ কুড়াইয়া আনা তাহার কারণ নয় কি? মায়ের যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে তিনি সেই অধিকারের ফলে দোকানে ভেজাল বন্ধ, সহরের রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করিতে পারেন। ...বহির্জগতে মাতৃস্নেহের এরূপ কার্য্যক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষেরা এখনও বিশেষ–কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।[৩২]

স্বাস্থ্যের সূত্র ধরে মেয়েদের যে সামাজিক অধিকারের দাবি তা ক্রমশই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষার দাবি। এই শতাব্দীর সূচনা থেকেই নারীর আর্থিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রগতির বিষয়গুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী–সংসদের দাবি হিসেবে উঠে এসেছিল। কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক

মহিলা সম্মেলনেও সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেই অধিবেশনের বিবরণ পাওয়া যায় *প্রবাসী* পত্রিকায় কমলা দেবীর লেখায়। অধিবেশনে বলা হয়, *নারীদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা জাতীয় কার্য্যক্ষেত্রে নিজেদের কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে মাতৃত্বের কার্য্যেও অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।*[৩৩] সবদেশে ও সকল ক্ষেত্রে নরনারীর সমান অধিকারের প্রস্তাব গৃহীত হয় অধিবেশনে। অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামসংস্কার, বালিকাদের শিক্ষা, সমাজকর্মীদের শিক্ষা, চলচ্চিত্র, স্কুলের খাদ্য পর্যবেক্ষণ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য, আইন সংক্রান্ত অধিকারের অভাব, রাষ্ট্রীয় অধিকার, মাতৃমঙ্গল ও প্রসবকালীন মৃত্যুর হার, নারী ও শিশু ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। প্রসবকালীন মৃত্যুর হার নিয়েও এই অধিবেশনে বিশেষ আলোচনা হয়েছিল। নারীর অধিকার রক্ষার জন্য প্রস্তাব উঠেছিল নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতিপ্রতিষ্ঠা করার। মেয়েরা ক্রমশ নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে কিভাবে রাজনৈতিক পরিসরে নিয়ে যাচ্ছিল তার সাক্ষ্য বহন করেছিল এই সময়ের মেয়েদের লেখাগুলি।

স্বাস্থ্য রক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পরিবারের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মেয়েদের নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষায় যে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত এই বোধ জাগরিত হয় মেয়েদের মধ্যে। ১৯৪০ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি *যুগান্তর* পত্রিকার সাময়িকীতে ইন্দিরা দেবী লেখেন:

> সাংসারিক জীবনযাত্রা সুন্দরভাবে স্বচ্ছলতার সঙ্গে নির্ব্বাহ করবার জন্যে আমরা নানাভাবে নানাদিক দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি। সংসারে শান্তি ও স্বস্তি বজায় থাকে সেজন্য ছেলে মেয়েদের মানুষ করা ব্যাপারেও আমাদের সাবধানতার শেষ নেই। আমরা অর্থাৎ মেয়েরা সব দিক দিয়েই সাবধানতা অবলম্বন করি যেমন সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমগ্র পরিবারের মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখবার দিকেও আমাদের দৃষ্টি থাকে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, আমরা আমাদের নিজের দিকে দৃষ্টি দিই না। স্বাস্থ্যের কথা আমরা ভুলে গেছি, মনের সুস্থতা ও শান্তির ব্যাপারেও আমরা ঠিক ততখানি উদাসীন।[৩৪]

কুসংস্কার মেয়েদের স্বাস্থ্যের কতখানি ক্ষতি করে সেইপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন:

> পুর্ণগর্ভা স্ত্রীকে পৃথক করে রাখার রীতি আছে, কিন্তু সেটা আমাদের এমন কুসংস্কারে বদ্ধ হয়েছে তা বলবার নয়। পুর্ণগর্ভা স্ত্রীকে আমরা একেবারে আত্মীয়স্বজন স্পর্শ থেকে মুক্ত করে দিই তার স্থান হয় এমন ঘরে, যেখানে আলো-বাতাস নেই, গোয়ালঘর বা তদনুরূপ ঘর হয় তখন আঁতুড়ঘর। যে অবস্থায় মানুষের প্রয়োজন হয় প্রিয়জনের উপস্থিতি ও স্নেহস্পর্শ সে সময় একাকিনী অন্ধকার নোংরা ঘরে এই ভাবে

থাকা নরক যন্ত্রণা ছাড়া আর কি! এতে প্রসূতির স্বাস্থ্যের ভয়ানক ক্ষতি হয়।[৩৫]

মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকেই মাতৃত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। বিংশ শতকে তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের মত ট্যাবু বিষয়ও মেয়েরা আলোচনা করতে প্রস্তুত হয়। ১৯৩৮ সালে *জয়শ্রী* পত্রিকায় শান্তিসুধা ঘোষ লেখেন:

> নারীর পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব লইয়া যাঁহারা অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব গোটা মনুষ্যত্বের এক একটি অংশ মাত্র, তত্তত শিক্ষা দ্বারা জীবনের সম্পূর্ণতা আসেনা বরং মানবজীবনকে সম্পূর্ণ করিবার উপযোগী মনুষ্যত্বের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব সহজেই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে।[৩৬]

জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিতর্কের এক টুকরো ছবি ধরা পড়ে অনিন্দিতা দেবীর রচনায়। তিনি লেখেন:

> বাস্তবিক, দেখিয়া যেমন আশ্চর্য তেমনি দুঃখবোধ হয় যে, যে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি, আপনার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের স্বাধীনতা মানুষের সর্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু ও মানুষের প্রধান চিহ্ন, তাহাতেই মানুষের সবচেয়ে অবিশ্বাস ও অনিচ্ছা। ... মানুষ সংস্কার, অভাব, ঐতিহ্যের দাস। তাই দাসত্বের শৃঙ্খল তাহার হাত–পা হইতে খুলিয়া দিলেও সে তাহাই আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। মেয়েরা ইহাতে আরোই কঠিনভাবে বদ্ধ বলিয়াই যে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় আবিষ্কারে বিজ্ঞান তাহাদের প্রধান বিশেষত্ব ও গৌরবের বস্তু মাতৃত্বকে যুগ–যুগান্তরের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যই মর্যাদা, গৌরব ও আনন্দের বস্তু করিয়া তুলিবার স্বাধীনতা দিতেছেন, তাহাতে অখণ্ড কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আপত্তি তাঁহাদেরও করিতে দেখা যায়।[৩৭]

জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে মধ্যবিত্ত মেয়েদেরও যে দ্বিধা ছিল অনিন্দিতাদেবীর রচনাতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুধাময়ী দেবী লিখছেন:

> অধিক সন্তান হইলে মায়ের স্বাস্থ্য যে ক্রমশই ভাঙ্গিয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য। মায়ের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিলে এদেশের লোককে বড় একটা উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সন্তানগণ যে তাহার ফল ভোগ করে কত দিক দিয়া তাহা আপাত দৃষ্টিতে বুঝা যায় না, অন্তত অনেকে তাহা বুঝিতে চায় না। এক একটি সন্তান হইতে মায়ের দেহের যতখানি শক্তি ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করিতে সময় লাগে যথেষ্ট। সেই ক্ষতির পূরণ হইতে না হইতে যদি আর একটী সন্তানের জন্ম তাঁকে দিতে হয়, তবে তাঁর দেহের উপর যে জুলুম হয় তাতে সন্তানেরও ক্ষতি করে...। বয়সের অল্প ব্যবধানের শিশুদের লইয়া মা কাহার অভাবই বা পূরণ করেন, কার অভিযোগই বা আগে শোনেন? ইহার উপর রহিয়াছে সংসারের সকল কর্তব্য... বহু সন্তানবতী মাতার

পক্ষে সকল দিক রক্ষা করা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার।[৩৮]

মেয়েদের দুর্দশা এবং মাতৃত্বের দায় নিয়ে নানা বাদপ্রতিবাদের মধ্যেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মেয়েরা তাদের কথা বলা থেকে বিরত থাকেনি। শুধু যে মুখ বুজে রাঁধা–বাড়া আর সংসারসেবা তাদের কাজ নয়, তাদেরও যে মতামত প্রকাশের অধিকার আছে, নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু মেয়েরা এই জায়গাটাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। ১৯০৯ সালে আমোদিনী ঘোষ লিখছেন:

> ...আমাদের এই গৃহের পরিসর কতখানি তাহার উপর আমাদের নজর করিতে হইবে, রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার গৃহ হইতে তাহার সীমানা উঠাইয়া নিয়া তাহাকে জ্ঞান, কল্যাণ ও কর্ম্মের ত্রিধারা সংযোগে পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী সঙ্গমের মত করিয়া তুলিতে হইবে, তখন ভবিষ্যকাল তাহার অঙ্ক হইতে তিমিরনাশী প্রভাত সুর্য্যের মত প্রকাশিত হইবে।[৩৯]

মেয়েদের অধিকার রক্ষার দাবিপূরণ সম্পূর্ণ সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও উনিশ শতক থেকে গার্হস্থ্যভাবনার ক্ষেত্রে যে নতুন পরিসর গড়ে উঠেছিল তা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে নিঃসন্দেহে কিছুটা হলেও শক্তি জুগিয়েছিল। মেয়েদের বক্তব্যে ধরা পড়েছিল তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা যেখানে মাতৃত্বের ভার যে মেয়েদের কাছে গুরুতর তা বোঝাবার প্রয়াস ছিল মেয়েদের লেখায়। শিক্ষিত বাঙালি সমাজে গার্হস্থ্যের ধারণার সঙ্গে পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষার যে ধারণাটি জড়িয়ে ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেনি মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্বাস্থ্যকে, বিশেষত প্রজনন স্বাস্থ্যকে। মেয়েদের কলমের গতি নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও এই সময়ে অব্যাহত ছিল, পরবর্তী শতক জুড়ে যার ক্ষেত্রটি ক্রমশ বৃহত্তর হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১. ভারতী রায়, সংকলিত ও সম্পাদিত, *নারী ও পরিবার, বামাবোধিনী পত্রিকা* (১২৭০–১৩২৯ বঙ্গাব্দ) (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২), পৃ. ৭৬।

২. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ৪৪।

৩. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ৮৪।

৪. প্রদীপ বসু, সম্পাদিত, *সাময়িকী পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯) পৃ. ৬৮২।

৫. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ৯৬–৯৭।

৬. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ১২৭।
৭. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ১৪৩।
৮. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ১৮৩।
৯. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ২১০।
১০. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ২০৬।
১১. Aparna Bandyopadhyay, *Desire and Defiance A Study of Bengali Women in Love 1850-1930*, (Delhi: Orient Blackswan, 2016) p. 86.
১২. প্রদীপ বসু, *সাময়িকী*, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৪২৭।
১৩. প্রদীপ বসু, *সাময়িকী*, দ্বিতীয় খণ্ড , পৃ. ৫২০।
১৪. প্রদীপ বসু, *সাময়িকী*, দ্বিতীয় খণ্ড , পৃ. ৫৮৭।
১৫. প্রদীপ বসু, *সাময়িকী*, দ্বিতীয় খণ্ড , পৃ. ৬৬।
১৬. ভারতী রায়, *নারী ও পরিবার*, পৃ. ১৪৫।
১৭. *অন্তঃপুর* পত্রিকা, চৈত্র ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ১৯০৩, পৃ. ১৩৫।
১৮. *অন্তঃপুর* পত্রিকা, চৈত্র ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ১৯০৩, পৃ. ১৩৪।
১৯. চিত্তব্রত পালিত, পূর্ণিমা মুখার্জী সম্পাদিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, (কলকাতা : *সুজন*, ২০০৫) পৃ. ২৯।
২০. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৩২।
২১. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৩৭।
২২. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৪৮–৪৯।
২৩. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৬১।
২৪. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৬১।
২৫. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৬২।
২৬. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৯৭।
২৭. চিত্তব্রত পালিত, *অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ*, পৃ. ৯৮।
২৮. প্রদীপ বসু, *সাময়িকী*, দ্বিতীয় খণ্ড , পৃ. ৫৬৮।
২৯. ভারতী রায়, সংকলিত ও সম্পাদিত, *প্রবাসী–তে নারী* ১৯০১–১৯৪৭,

(কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬), পৃ. ৭২।

৩০. ভারতী রায়, *প্রবাসী–তে নারী*, পৃ. ৭৫।

৩১. ভারতী রায়, *প্রবাসী–তে নারী*, পৃ. ৭৬।

৩২. ভারতী রায়,*প্রবাসী –তে নারী*, পৃ. ৯২।

৩৩. ভারতী রায়, *প্রবাসী –তে নারী*, পৃ. ২৮৫।

৩৪. *যুগান্তর সাময়িকী*, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০, পৃ. ১২।

৩৫. *যুগান্তর সাময়িকী*, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০, পৃ. ১২।

৩৬. শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, *পথের ইঙ্গিত নির্বাচিত সংবাদ–সাময়িকপত্রে বাঙালি মেয়ের সমাজভাবনাঃ* ১৯২৭–১৯৬৭, (কলকাতা: স্ত্রী, ২০০৭), পৃ. ১৫১।

৩৭. অভিজিৎ সেন, সংকলিত, *অনিন্দিতা দেবীর রচনা সংকলন*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭), পৃ. ৫৫৪।

৩৮. শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, *পথের ইঙ্গিত*, পৃ. ২২৫।

৩৯. প্রদীপ বসু, *সাময়িকী*, দ্বিতীয় খণ্ড , পৃ. ৫২৪।